অ্যাবস্ট্রাক্ট (নির্যাস)

বাঙালি মেয়েদের ভ্রমণকথা বললে প্রাথমিক ভাবে কিছুই মনে হয় না, কিন্তু যদি বলা যায় উনিশ শতকের ঘোমটার ঘেরাটোপে থাকা বাঙালি মেয়েদের ভ্রমণকথা তাহলে একটু ভাবতে হয় বৈকি! যে মেয়েদের মেয়েবেলা বলেই কিছু থাকতে পারত না স্মৃতি-শাসিত সমাজের চাপে, আর মুসলিম বা পরে ইংরেজ শাসকের হাতে প্রধর্ষিত হওয়ার ভয়ে, সেই সমাজের মেয়েদের বেড়ানো, রীতিমতো ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে, খোলা আকাশের নীচে মনের ইচ্ছেয়, খুশিতে, আনন্দে বেড়িয়ে বেড়ানোর ভাবনা একটা সোনার পাথরবাটির মতোই চমৎকার কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৫০-এর আগে পর্যন্ত সারদাসুন্দরী দেবীর ভ্রমণের একক ইতিহাস পাওয়া গেলেও ১৮৬৪-র কিছুদিন পর থেকে বলা ভালো ভ্রমণের ধারা শুরু হল তবে তাও প্রতিষ্ঠিত হতে আরো চার দশক লেগে গিয়েছিল। এই দ্বিতীয় দফায় পথের আগল খুলে দিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবরত সহায়তায় এবং প্ররোচনায়। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তারপর ক্রমশ এই ভ্রমণ সংকল্প হয়ে উঠল মেয়েদের সমষ্টিগত জোরদার সংকল্প। এতোটাই জোরালো যে ক্রমশ ১৮৮২তে কৃষ্ণভাবিনী দাস বিলেত যাওয়ার 'স্পর্ধা' দেখালেন, নিজের ব্যক্তিজীবনের সর্বাধিক ক্ষতি মেনে নিয়ে। এভাবে ক্রমশ বিলেতই নয়, সমস্ত ইউরোপ (অনেকে একাধিকবার), জাপান, চীন, মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েরা যথাসাধ্য শীল বজায় রেখে বেরিয়ে পড়লেন স্বামীর হাত ধরে, কখনো বা তাঁর অবর্তমানে অন্য কোনো সহচরীর হাত ধরে (বিমলা দাশগুপ্তা) কিম্বা স্বামীর বাধায় যেতে না পারায় সেই স্বামীরই মৃত্যুর পর কলেজের বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে দেখলেন ইউরোপ এবং তার শিল্পচর্চার ইতিহাস (উমা সিদ্ধান্ত)। কেউ গেলেন প্যারিসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (শোভনাসুন্দরী দেবী), আর স্বাধীনতার পর যখন ক্রমশ ছাত্রী হিসেবেই মেয়েরা নিজেদের দেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির গন্ডী ছাড়িয়ে অন্য মহাদেশে পড়তে গেলেন, মেয়েদের জন্য গড়ে ওঠা পশ্চিমী আন্দোলন গুলির সাক্ষী হলেন ততদিনে দেশের মধ্যেও মেয়েরা ছড়িয়ে পড়েছেন সমস্ত এমনকি অজ্ঞাত ভ্রমণ-বিন্দু গুলিতেও। তবে সবাই যে সমান আয়াসে, সমান আরামে সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভ্রমণ করতে পেরেছেন তা নয়, তবে তাঁদের মূলগত মনোবৃত্তির একটিই সুর ছিল, যা ঐকতানে বেজে উঠেছে, তা হল স্বাধীনতা,

শিক্ষা এবং তেজ। সমাজে নারীর জন্য কোনো পেশা ছিল না অষ্টাদশ শতকে। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ মেয়েদের নিদর্শনে বিংশ শতকের পরার্ধে, স্বাধীনতার পর মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হতে পারলেন (যদিও প্রথম দিকে তা কেবলি শিক্ষকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল)। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের অবদান যথেষ্ট। এই পেশা নির্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে মেয়েরা কিছুটা হলেও ব্যক্তিগত আর্থিক পরিসর গড়ে তুলতে পারলেন এবং ক্রমশ নিজেদের প্রাপ্তমনস্ক স্বাধীনতার বক্তব্য সমাজে ছড়িয়ে দিলেন; ক্রমশ ভ্রমণ হয়ে উঠল নারীর নিজস্ব জানালা। সেই যাত্রাপথের ক্রমানুসারিক অভিযোজন-বৃত্তান্তটি স্পর্শ এবং প্রকাশ করাই আমাদের কাজের লক্ষ্য।